জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় তহবিল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য একটি বাস্তবসম্মত তহবিল গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। গত শনিবার সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ভাষণ দানকালে তিনি এ আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ইউএনএফসিসিসি'র মাধ্যমে বার্ষিক সুনির্দিষ্ট অর্থ সহায়তা দেয়ার জন্য দাতাদের পক্ষ থেকে একটি বাস্তবোচিত তহবিল গঠনের আহ্বান জানাচ্ছে বাংলাদেশ। তহবিল সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রস্তাবনা : এই তহবিলের প্রথম পর্যায়ের ব্যবহার ২০১০ সাল থেকে শুরু হয়ে ২০২০ সাল পর্যন্ত চলবে। পরে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ছোট দ্বীপ ও উপকূলীয় নিম্নভূমি অধ্যুষিত দেশসমূহের অভিযোজন চাহিদা মেটাতে প্রতি বছর এই তহবিলের বেশীর ভাগ অর্থ সরবরাহ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কেবল ঋণ হিসেবে এই অর্থায়ন হবে না, অর্থায়ন হবে পরিবর্তিত অভিযোজন চাহিদা মূল্যায়ন করে। তৃতীয়ত, ব্রাসেলস বৈঠকে গৃহীত কার্যক্রম অনুযায়ী এই অর্থায়ন উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ধনী দেশগুলোর সরকারী উন্নয়ন সাহায্যের (ওডিএ) লক্ষ্যমাত্রা ২০১০ সাল পর্যন্ত মোট জাতীয় আয়ের শূন্য দশমিক সাত শতাংশ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর শূন্য দশমিক ২ শতাংশ থেকে অবশ্যই অতিরিক্ত ও আলাদা হবে। স্মরণ করা যেতে পারে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৪তম অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকটের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা সারা বিশ্বের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তার আহ্বান জানান। স্টকহোমের আলোচ্য ভাষণে তিনি আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দিয়েছেন। বিশ্ববাসীর স্বার্থ রক্ষায় বৈশ্বিক অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি ইউএনএফসিসিসি'র অধীনে একটি ইন্টারন্যাশনাল এডাপটেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশ আর্টিক কাউন্সিলের আদলে একটি হিমালয়ান কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যেসব দেশে সবচেয়ে মারাত্মকভাবে পড়ছে, বাংলাদেশ তার অন্যতম। সঙ্গতকারণেই প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে বাংলাদেশ বর্তমানে কি ধরনের প্রভাবের মোকাবিলা করছে এবং আগামীতে আরও কি ধরনের প্রভাবের আশংকা করছে- তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এই প্রভাবজনিত সংকট মোকাবিলায় কি রকম পদক্ষেপ ও কর্মসূচী বাংলাদেশ নিয়েছে তারও উল্লেখ করেছেন। দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, খুবই সামান্য গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ করেও বাংলাদেশ নিম্নভূমি হওয়ায় উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশের দক্ষিণ উপকূল অঞ্চলে প্রবল জোয়ার-ভাটা, বর্ষা মওসুমে বৃষ্টির অভাব, বিলম্বে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, ফসলহানি, উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ, নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস, দক্ষিণাঞ্চলে মরুকরণ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে তিনি যেমন বাংলাদেশের বর্তমান নাজুক অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন, তেমনি আগামীতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সুন্দরবনসহ দেশের এক চতুর্থাংশ এলাকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হওয়ার আশংকার কথাও ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি বর্তমান ও আশংকিত বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি, উন্নয়ন, নদ-নদী খনন, বনায়ন, বাস্তুহীনদের আবাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গৃহীত কর্মসূচীর বিবরণ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের গৃহীত কর্মসূচীকে বিশ্বে মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রধানত উন্নত বিশ্ব দায়ী হলেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হচ্ছে সব দেশই। সবচেয়ে বেশী ক্ষতির শিকার হচ্ছে স্বল্পন্নোত দেশগুলো- উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনে যাদের ভূমিকা অতি সামান্য। উন্নত দেশগুলো তাদের আর্থিক সামর্থ্য ও উন্নত প্রযুক্তির কারণে ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় একটা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশও নানা পদক্ষেপ ও কর্মসূচী নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু সব স্বল্পোন্নত ও অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ চরম ঝুঁকির মধ্যে

পতিত। তাদের না আছে অর্থ, না আছে প্রযুক্তি। এ সব দেশে মানবিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশ জাতীয় উদ্যোগে যে সব পদক্ষেপ ও কর্মসূচী নিয়েছে তা যথেষ্ট নয়। এ জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় তহবিল গঠনের যে আহ্বান জানিয়েছেন, তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। সমস্যাটি দেশ বিশেষের নয়, গোটা বিশ্বের। তাই এর সমাধানে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক উদ্যোগ-পদক্ষেপ প্রয়োজন। প্রস্তাবিত তহবিল গড়ে উঠলে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবিলায় স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামর্থ্য বাড়বে। আমরা আশা করবো, এ রকম একটি তহবিল গড়ে তোলা হবে। এই সাথে আন্তর্জাতিক ও এডাপটেশন সেন্টার ও হিমালয়ান কাউন্সিল গঠনের বিষয়টিও সক্রিয় বিবেচনা লাভ করবে। যেহেতু মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণই উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ, সুতরাং বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপও নিতে হবে।

বাপেক্সের সম্ভাবনাময় গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার

শিল্প, বাণিজ্য ও জ্বালানির জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের তীব্র সংকটের মুখে বাপেক্স আশার বাণী শুনিয়েছে। নেত্রকোনায় একটি নতুন গ্যাসফিল্ড আবিষ্কারসহ স্থলভাগে পাঁচটি অধিকতর সম্ভাবনাময় গ্যাস ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছে বাপেক্স। পাইপ লাইনে নতুন গ্যাসের সংযোগ দিতে বাপেক্স স্থলভাগে গ্যাসের সম্ভাব্যতা যাচাই করছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সিসমিক পরীক্ষার ভিত্তিতে শ্রীকাইল, কাপাসিয়া এবং সুন্দলপুরে ইতোমধ্যেই ভূমি অধিগ্রহণ করেছে এবং আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ফিল্ড উন্নয়নের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। মোবারকপুর ও নেত্রকোনাতেও অনুরূপ কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। বার্তা সংস্থা বিএসএসকে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান হোসেন মনসুর জানিয়েছেন, গ্যাস রিজার্ভ বাড়াতে তারা প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পেট্রোবাংলার একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেছেন, ১০ বছর গ্যাস অনুসন্ধান করার কোন কাজ না করার ফলেই জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী সন্তোষজনক গ্যাস সরবরাহ করা যাচ্ছে না। অথচ ১৯৯৫ সালের জাতীয় জ্বালানি নীতি অনুযায়ী ২০০৯ সালের মধ্যে অন্ততঃ ৩৬টি অনুসন্ধান পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল। আশার কথা, ইতোমধ্যে বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ডে পেট্রোবাংলা সফলতার সাথে অগ্রগতি সম্পন্ন করায় গত ৬ মাসে গ্যাসের উৎপাদন ১৮০ এমএমসিএফটি বেড়েছে। যদিও বর্ধিত এই হার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারছে না। বর্তমানে শিল্প, জ্বালানি ও বাণিজ্যিক খাতে গ্যাসের চাহিদা ১৮০০ থেকে ২২ শ' এমএমসিএফএ উন্নীত হওয়ার ফলে যোগান সংকট দেখা দিয়েছে।

বিগত কয়েক বছরে নতুন কোন গ্যাসফিল্ড আবিষ্কৃত না হওয়া এবং উত্তরোত্তর গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধির ফলেই গ্যাস সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে ২০১১ সাল নাগাদ গ্যাসের তীব্র সংকটের আশঙ্কার কথাও বলা হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই গ্যাসনির্ভর শিল্প-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি খাতে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশংকা করা হয়েছিল বিভিন্ন মহল থেকে। বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, কখনও বিদ্যুৎ উৎপাদন ঠিক রাখার স্বার্থে সার কারখানায় গ্যাস বন্ধ, আবার কখনও সার উৎপাদন অব্যাহত রাখতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ রাখতে হচ্ছে। গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকট শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। গ্যাস সংকটের কারণে বহু শিল্প-কারখানায় সংযোগ বন্ধ রাখায় বিনিয়োগকৃত কোটি কোটি টাকা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাবে গৃহস্থালীসহ জীবনের সব ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এই বাস্তবতায় গ্যাস উত্তোলন ও অনুসন্ধানের উপর সকল মহলই গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বর্তমান সরকার বাপেক্সকে শক্তিশালী করা এবং গ্যাস উত্তোলন ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের জোর তাগিদ দিয়েছেন। দেশের গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাপেক্সকে গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারটি জাতীয় স্বার্থেই জরুরী হয়ে পড়েছিল। কারণ, দেখা গেছে, চুক্তিসহ নানা দুর্বলতার অজুহাতে আমাদের গ্যাস আমাদেরকেই অধিক মূল্যে কিনতে হচ্ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিসহ সর্বত্র।

দেশে জ্বালানি সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন এবং উন্নয়নে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি (বাপেক্স)'র ভূমিকা অতি উজ্জ্বল। সামর্থ্য ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাপেক্স ইতোমধ্যে দেশীয় জ্বালানি সম্পদ উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। অথচ তেল, গ্যাস অনুসন্ধান ও আহরণে আত্মনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে উপযুক্ত সরঞ্জাম, অবকাঠামো ও জনবলের মাধ্যমে বাপেক্সকে যথেষ্ট শক্তিশালীকরণে অতীতে সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, বাপেক্সের মত দেশীয় তেল, গ্যাস কোম্পানিকে শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করা গেলে আমাদের তেল, গ্যাস অনুসন্ধান এবং উন্নয়নে বিদেশী কোম্পানীর মনোপলি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হতো। বাপেক্সের অনুরোধে বর্তমান সরকার বাপেক্সকে শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করার প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সিসমিক সার্ভের জন্য সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করেছে তার সফলতার অংশ হিসেবেই নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও আগে থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে ইতোমধ্যে যে ক্ষতি হয়েছে, তা এড়িয়ে জাতীয় স্বার্থ আরও বেশী সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো। আশা করা যায়, নতুন যে কয়টি গ্যাস ফিল্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার বাইরেও সফলতার ছাপ রাখবে বাপেক্স। সুতরাং বাপেক্সকে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়া কোন বিবেচনাতেই লুজিং ব্যাপার নয়। বরং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে তেল-গ্যাস সেক্টরে স্বনির্ভরতার জন্য এটি একটি বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। আগামীতে দেশের স্থলভাগ এবং সমুদ্র এলাকায় গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলনে বাপেক্স একক সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুক, এ প্রত্যাশা দেশবাসীর।

শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিকল্পিত নগরায়নের বিকল্প নেই

আবদুল আউয়াল ঠাকুর

'নগরায়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকগণ অস্তিত্ব রক্ষার্থেই নগরায়নের পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজউক ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের সমন্বয়হীনতার কারণে গোটা রাজধানী ঢাকা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অনুষ্ঠানে ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকা বলেছেন, জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ দেশের উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়। তিনি আগামী একশ' বছরের জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে এ জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। আলোচকদের কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, খোদ রাজধানীতে ৪০ লাখের অধিক নগর দরিদ্র রয়েছে, যারা বিভিন্ন বস্তিতে বাস করে। এদের ৯৭ ভাগ মানবেতর জীবনযাপন করছে। ফাও'র মহাপরিচালক সম্প্রতি বলেছেন, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। এই জনসংখ্যার অন্তত ৭০ ভাগ নগরে চাপ সৃষ্টি করবে। সব মিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই সাথে উন্নয়নের সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনার ওপর যখন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তখন দেখা যাচ্ছে নগরায়নের সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে পরিকল্পনাবিদের অভাব রয়েছে। এ পেশায় নতুনদের আকৃষ্ট হওয়ার হারও খুব কম। সেই সাথে নগর পরিকল্পনায় দুর্নীতির প্রত্যক্ষ যোগসূত্র থাকায় গোটা পরিস্থিতি নাজুক আকার ধারণ করেছে।

১৯৭৬ সালে বিশ্বের কোটি কোটি আশ্রয়হীন মানুষের সমস্যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে কানাডার ভ্যাঙ্কবারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম মানববসতি মহাসম্মেলন। সম্মেলনে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য আশ্রয় সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ সকল দেশের সরকার প্রধানগণ উদ্যোগ গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন। এই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এক সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৮৬ সাল থেকে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্বের গৃহহীন মানুষের আশ্রয় সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত সকল দেশে 'বিশ্ব বসতি দিবস' পালনের কর্মসূচী চালু করা হয়। '৯৬ সালের জুন মাসে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে দ্বিতীয় মানববসতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শহরে, নগরে এবং নগরায়নশীল এই বিশ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতিতে বসবাসরত সকল স্তরের মানুষের আবাসন উন্নয়নের জন্য বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি ও একটি নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এ বছর বিশ্ব বসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'নগরায়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা'। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর সিংহ ভাগই এখন পর্যন্ত

গ্রামের বাসিন্দা। একটু খাবার, কাজ তথা নিতান্ত বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম প্রয়োজনেই গ্রামের অসহায় মানুষের প্রতিদিনই রাজধানীমুখী হচ্ছে। ফলে রাজধানীর ওপর প্রতিনিয়তই চাপ বাড়ছে। এই বাস্তবতায়, ফেলোশিপ আর্কএশিয়ার আহ্বায়ক স্থপতি রবিউল হুসাইন মনে করেন, প্রায় ৪শ' বছরের পুরনো জনপদ ঢাকা আজ অপরিকল্পিতভাবে মহাজাগতিক বাস্তবতায় ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে তো হচ্ছেই। কিন্তু মহাজাগতিক ও রাজধানী ঢাকার বেড়ে ওঠার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে তিনি বলেছেন, মহাজাগতিক বিশ্ব অদৃশ্য এক কঠোর নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে ক্রমাগত বিন্যাসিত হচ্ছে গ্রহ-তারা নিয়ে। বিশাল শূন্যতার মধ্যে এই প্রসারের জন্য কোন পরিসরের অভাব নেই, কখনো হবে না। সেই তুলনায় ঢাকা শহর শৃঙ্খলা ও নিয়মহীন। এর জায়গার খুব অভাব, প্রবল জনশক্তির চাপ এবং প্রতিটি বিষয় অনিয়মই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। নগর পরিকল্পনা যেভাবেই হয়েছিল, যেখানে একটি অঞ্চল নিয়ে একেকটি পৃথক ব্যবহারিক কর্মকাণ্ড যেমন আবাসিক, বাণিজ্যিক, বিনোদন, সবুজ উন্মুক্ত প্রান্তর, জলাভূমি, নদী, খাল ইত্যাদি সন্নিবেশিত রূপ থাকার কথা ছিল। এখন একটির সাথে অন্যটি মিলেমিশে জগাখিচুড়ি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-পরিচয় লোপ পেয়েছে বহমান অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের দরুন। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাব যেন ঢাকা শহরকে আরো মর্মান্তিক শহরে পর্যবসিত করে তুলেছে। আইন যে নেই তা নয়। প্রতিটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও সুচারুরূপে আইন তখনই আইন যখন তা মান্য করা হয়। তিনি বাস্তবতাই মনে করেন, পৃথিবীর উন্নত শহরে জনসংখ্যার সাথে সাথে সেবা অর্থাৎ যোগাযোগের রাস্তা ও বাণিজ্যিক, আবাসিক সুযোগ-সুবিধা, কর্মসংস্থান, বিনোদন, উন্মুক্ত প্রান্তর, জলাভূমি, বিদ্যুৎ, গ্যাসের স্বাভাবিক প্রবাহ ও সরবরাহ সুনিশ্চিত রেখে সুচিন্তিতভাবে বাস উপযোগী করে তোলা হয়, সেই তুলনায় ঢাকায় এসব ব্যবস্থা করা হয়নি। অথচ হু হু করে দালানকোঠার সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে। অতএব আমাদের এই প্রিয় শহর ঢাকা প্রতিদিনের দৈব-দুর্বিপাকের শহরে পরিণত হচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে রাজধানী ঢাকা শক্তিশালী ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হলে এর অবস্থা কী দাঁড়াবে, তা নিয়ে অনেকেই শংকিত। ভূমিকম্প-পরবর্তী উদ্ধার কাজ চালাবার মতো অবস্থা বিদ্যমান নেই। বিশেষ করে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি থেকে জীবনরক্ষার জন্য উন্মুক্ত মাঠের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বর্তমান নগরায়নে প্রকৃতই তার কোন সংস্থান নেই। ২১ সেপ্টেম্বর রাতের ভূমিকম্পে রাজধানীবাসী আঁচ করতে পেরেছে তারা সত্যিই বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্যানুযায়ী, ঐ রাতের ভূমিকম্পটি ছিল ৫.৪ মাত্রার। উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ৫৫২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে মিয়ানমারের কোনো এলাকায়। ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে শুধু যে ঢাকা তাই নয়, বরং বলা যায়, বাংলাদেশের অবস্থান একটি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার মধ্যে হওয়ায় সারাদেশই এই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অধিকসংখ্যক মানুষের বসবাসের জায়গা তৈরী করতে গিয়ে খাল-বিল, নালাসহ নিচু জমি ভরাট করে মাটি জমাট বাঁধার আগেই ভবন তৈরীর ফলে পানিস্তর হ্রাস পাচ্ছে এবং ভূমিকম্প প্রতিরোধক ডিজাইনহীন ইমারত ভেঙ্গে পড়ার অধিকতর আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দুর্বল ভিত্তি ভূমির মধ্য দিয়ে ভূমিকম্পের তীব্রতা খুব তাড়াতাড়ি পরিবাহিত হওয়ার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও খোদ রাজউকই পূর্বাচল ও উত্তরার তৃতীয় প্রকল্পের প্লট তৈরী করেছে নিচু জমি ভরাট করে। এদিকে মাত্রাতিরিক্ত নগরায়ন পরিকল্পনার কারণে অনেক নিচু জমিতে বহুতল ভবন নির্মিত হচ্ছে সঠিক পাইলিং ছাড়াই, যা ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে থাকবে সব সময়। অন্যদিকে পুরনো ঢাকা বলে পরিচিত মূল ঢাকার বাড়ীঘর, ভবন আরো বেশী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মন্তব্য করেছেন। এক জরিপে দেখা গেছে, ঢাকা মহানগরের ৬০ শতাংশ ইমারতের ভিত্তি দুর্বল মাটির উপর তৈরী। বিল্ডিং কোড মেনে ভূমিকম্প প্রতিরোধমূলক পরিকল্পিত নগরায়ন করা না গেলে ঢাকার ভবনগুলো ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে ডুবে থাকবে সব সময়, যার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই যাবে।

অপরিকল্পিত নগরায়নের সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে যানজটে। যত্রতত্র ভবন নির্মাণ, রাস্তার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকা, আড়াআড়ি রাস্তার অপর্যাপ্ততা এবং রাস্তাঘাট নির্মাণের সময় দীর্ঘমেয়াদী কোন পরিকল্পনা না থাকার পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অবৈধ অর্থের যোগসাজশ থাকায় দুঃসহ যানজটের কারণে নগর বাস অযোগ্য হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিদ্যমান অবস্থা বহাল রেখে যানজট নিসরণে এ পর্যন্ত যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তা কোনো কাজে আসেনি। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, সমস্যা যখন চিহ্নিত করা হয়, সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয় তার তিন-চার বছর পর। তখন ঐ পরিকল্পনা অকার্যকর হয়ে পড়ে। কারণ সমস্যা ততদিনে আরো গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে।

সমস্যা সমাধানের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না থাকার পেছনে প্রকৃতপক্ষে দায়ী নীতি-নির্ধারকগণ। এ যাবৎকাল নগরীকে বাসযোগ্য রাখার মতো কোন পূর্ণাঙ্গ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়নি। ১৯৪৭ সালে ঢাকা ছিল সাবেক পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী। তৎকালীন সরকার ঢাকা শহর উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নিলে ১৯৫৩ সালে টাউন ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট নামে একটি নীতিমালা গৃহীত হয়। এর উপর ভিত্তি করে '৫৬ সালে সাবেক ডিআইটি বর্তমান রাজউক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব ছিল ঢাকার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা। '৫৯ সালে ৩২০ বর্গমাইল এলাকার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছিল। এর আওতায় ছিল তৎকালীন ঢাকা, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা এবং এর আশপাশ এলাকা। এ পরিকল্পনায় পরবর্তী ২০ বছরের জন্য জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল ১.৭৫ ভাগ। এর উপর ভিত্তি করে ২০ বছর পর ১৯৭৯ সালে সেই জনসংখ্যার হিসাব ধরা হয়েছিল ১৪ লাখ ১৪ হাজার। অর্থাৎ এই পরিমাণ জনসংখ্যা বিবেচনায় রেখেই ঐ মহাপরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরিবর্তিত বাস্তবতায় উক্ত মহাপরিকল্পনায় অনুমিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ফলে ঐ পরিকল্পনা কোন কাজে আসেনি। '৭৯ সালে দীর্ঘমেয়াদী নগর উন্নয়নে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা নানা কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। '৮৯ সালে রাজউক ৫৯০ বর্গমাইলের জন্য কারিগরি সহায়ক প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্প '৯১ সালে শুরু হয়ে '৯৫ সালে শেষ হয়। বিভিন্ন কারণে এই পরিকল্পনাটি অসমাপ্ত থেকে যায়। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান ছাড়াই ঐ পরিকল্পনা তৈরী হওয়ার ফলে ঢাকা শহর অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে থাকে। এর ফলে নগরের বর্তমান যে চেহারা দাঁড়িয়েছে, তাতে না আছে পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধা, না আছে নাগরিক জীবনের কোন সুযোগ-সুবিধা। সুউচ্চ ভবনের নিচে পানিতে সয়লাব থাকে। একটু বৃষ্টিতে নগরের রাস্তাঘাট ডুবে যায়। কোথাও কোথাও সারা বছর সড়ক ডুবে থাকে ময়লা পানিতে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থতার সুযোগে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণীত না হওয়ায় এবং সেই সাথে নজরদারির অভাব ও অবৈধ অর্থের সম্পর্কের কারণে ঢাকা শহর ঘিরে যে ৪৮টি খাল ও ছয়টি নদী বিদ্যমান ছিল, এর অধিকাংশই হয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নয়তো বিলুপ্তির পথে। দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন সংস্থা মাঝে-মাঝে খাল, নদী উদ্ধারের ফটোসেশন করলেও তাতে কাজ খুব একটা হচ্ছে না। আবার সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে এখন রাজধানীর পুরনো খালগুলোর পরিসংখ্যানের কাগজপত্রও নেই। নাব্যতা সঙ্কটের পাশাপাশি বৈরী আচরণের কারণে বুড়িগঙ্গাসহ অন্যান্য নদ-নদীর এখন প্রায় মৃত্যদশা। অথচ এই নদ-নদীই এক সময় রাজধানী ঢাকাকে প্রাকৃতিক সুরক্ষা দান করেছে। পরিবেশকে রেখেছে বাসযোগ্য। নদীগুলো বাঁচানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের কথা সচেতন মহল থেকে বারবার বলা হলেও দেখার কেউ না থাকাতে অথবা নানা প্রভাবপ্রতিপত্তির কারণে কিছু হচ্ছে না। মূল সমস্যা যে পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নজনিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতার অভাবের পাশাপাশি নাগরিক দায়িত্ববোধের অভাব, অশিক্ষা এবং কুশিক্ষাও এর জন্য কম দায়ী নয়।

রাজধানীর যানজটের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অপরিকল্পিত নগরায়ন। বলা যায়, যখন রাজধানী অপরিকল্পিতভাবে বেড়ে উঠেছে তখন কেউ দেখেনি অথবা দেখার প্রয়োজনীয়তাবোধ করেনি। রাজধানীর পূর্ণাঙ্গ কোন পরিকল্পনা না থাকার ফলেই যে এটা হয়ে থাকতে পারে তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন যখন সঙ্কট তীব্রতর আকার ধারণ করেছে তখন নানামুখী ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের নানা কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাজধানীর সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়নে কিছু বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সে ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলেও কাজের গতি একই মাত্রায় নেই। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও যানজট নিরসনে রাজধানীর সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়নে কিছু ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। সেসব কাজের অগ্রগতিও আগের মতো নেই। রাজধানীর যানজট নিরসনে পাতাল রেল, বহুতল সড়ক, মনোরেলসহ নানা পরিকল্পনার কথা বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। কার্যত বিগত জোট সরকারের আমলে দুয়েকটি ফ্লাইওভার নির্মাণ ছাড়া আর তেমন কোন উন্নয়ন দৃশ্যমান নয়। ফ্লাইওভার নির্মিত না হলে রাজধানীর যানজটের অবস্থা কি দাঁড়াতো, তা হয়তো এখনি বলা যাবে না। তবে বিদ্যমান ফ্লাইওভারগুলোর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে এক এলাকায় জট কমলেও চাপ বেড়েছে অন্যত্র। অনেকে বলছেন, যেসব দেশ এক সময় বহুতল সড়ক নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, তারাই এখন এসব থেকে সরে আসছে। আবার কেউ যখন পাতাল রেলের পক্ষে বলেন, অন্যরা তার বিরোধিতা করেন। সবকিছু মিলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোন বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি। অথবা বিশেষ

কোন কারণে তৈরি হচ্ছে না। অথচ এ ব্যাপারকে যতটা দুঃসাধ্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, ব্যাপারটি মোটেও সে রকম নয়। এ ধরনের সমস্যা কেবল আমাদের দেশই প্রথম মোকাবেলা করছে তা নয়, পৃথিবীর বহু দেশ এ ধরনের সমস্যা সফলতার সাথে মোকাবেলা করেছে। ব্যাংকক, ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশে এর উদাহরণ রয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি মুহূর্তে এ সমস্যা মোকাবেলা করছে। আমাদের দেশে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার আলোকে যেকোন দেশের একটি উদাহরণকে গ্রহণ করে তার বাস্তবায়নে আন্তরিক হলে মূল সমস্যার সমাধান হতে পারে। নগর জীবনে মানুষ বাড়বে, যানবাহন বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক। একে সমস্যা হিসেবে ধরলে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরঞ্চ জনসংখ্যা এবং যানবাহনের চাপ মাথায় রেখেই সমাধানের পথে এগুতে হবে। নীতিনির্ধারক এবং পরিকল্পনাবিদদের দূরদৃষ্টি না থাকলে সমস্যা সমাধানের নামে কেবল শ্লোগানের খই ফুটতে থাকবে। এ থেকে উপকার পাওয়া যাবে না। পরিকল্পিত নগরায়ন সুসম্পন্ন করতে অবশ্যই সামগ্রিক চিন্তার সমন্বয় অপরিহার্য।

নগরায়ন ধারণার সাথে কৃষি জমির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সেই সাথে আমাদের সামাজিক সম্পর্ক অনেকখানি নির্ভরশীল নগরায়নের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। নগরায়নের কারণে দিন দিন যেভাবে কৃষি জমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, তাতে খাদ্য সমস্যা প্রকট হবার আশঙ্কা উড়িয়ে দেবার কোন কারণ নেই। দেশ এমনিতেই আমদানীনির্ভর। এরপরে ব্যাপক খাদ্য সঙ্কট দেখা দিলে সমস্যা তীব্রতর হবে। ফাও-এর মহাসচিব বিশ্বকে সতর্ক করে দিয়ে ২০৫০ সালের মধ্যে অধিক খাদ্য উৎপাদনের যে আহ্বান জানিয়েছেন, তা বাস্তায়নেও পরিকল্পিত নগরায়ন অত্যন্ত জরুরী। কৃষি জমি রক্ষার্থে বর্তমান সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিষয়টিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। গ্রাম ও শহরকে আলাদা না করে উন্নয়নের ভাবনা একসাথেই করতে হবে। বিগত জোট সরকারের আমলে সারাদেশে গ্রামাঞ্চলে পরিকল্পিত আবাসন গড়ে তুলে কৃষি জমি রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণের কথা শোনা গিয়েছিল। এজন্য দাতাও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। বর্তমান সরকার রাজধানীর চারদিকে স্যাটেলাইট শহর গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিমন্ত্রীর ভাষায়, খুব শিগগিরই কাজ শুরু হবে। এদিকে, নগর উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থাগুলোতে পরিকল্পনাবিদের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। অথচ নগরায়নের মহাপরিকল্পনা করেন পরিকল্পনাবিদগণই। পরিকল্পনাবিদদের অভাবকে দুই ভাগে দেখা হয়– (১) অনেকেই মনে করেন, অবৈধ অর্থে যোগানদার হিসেবে এ অভাব কাজ করছে। (২) অনেকের ধারণা, আকর্ষণীয় বেতন-ভাতার অভাবে নতুনদের আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। যা-ই হোক, পরিকল্পনাবিদ ছাড়া প্রকৃত নগরায়ন সম্ভব নয়। বর্তমান নগরায়নের একটি বড় ক্ষত হচ্ছে নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত মানুষ। শহরের বস্তি এবং গ্রামের ছিন্নমূল মানুষেরা নাগরিক সুবিধার সম্পূর্ণ বাইরে। এদের মূল পরিকল্পনায় আনা না গেলে যত ধরনের চিন্তাই করা হোক না কেন তা সফল হবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অন্যদিকে বর্তমানে বহুতল ভবনে এমন এক শ্রেণী বেড়ে উঠছে, যাদের সমাজ, পরিবেশ, দেশ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে যথেষ্ট ভিন্ন ধারণা রয়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে আগামীতে। এই রাজধানী এবং দেশকে বাসযোগ্য রাখতে পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাসস্থান, কর্মসংস্থান যেকোন খাতের কথাই বলা যাক না কেন, পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরী। সুসমন্বিত পরিকল্পনা করা গেলে জনসংখ্যা সমস্যা নয়, বরং শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য। প্রতিবেশী ভারত ও চীনে জনসংখ্যা তাদের জন্য অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ। কেবল জনসংখ্যাধিক্যের জন্যই অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলো এই দুটি দেশের বাজার ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। চলমান বিশ্বমন্দাতেও সারাবিশ্ব তাকিয়ে আছে এদেশ দুটির দিকে। লক্ষণীয় হচ্ছে, এই দুটি দেশই গড়ে উঠেছে নিজস্ব মেধা, মনন, শক্তি ও পরিকল্পনায়। আমাদের সময় এসেছে নগরায়নসহ সবকিছুকেই পরিকল্পনামাফিক গড়ে তোলার।

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

সময়ের মূল্য দিতে হবে

সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। নদীর স্রোতকে বাঁধ দিয়ে আটকানো যায় বা নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু সময়কে কখনো আটকানো যায় না বা সময়ের গতিপথ পরিবর্তন করা যায় না। আমরা

প্রত্যেকে কাজের চেয়ে কথাকেই বেশি প্রাধান্য দেই। সময়ের কখনই তোয়াক্কা করি না, সময়কে কাজে লাগালে জীবনের উন্নতি সম্ভব। আলস্যে দারিদ্র্য আনে, পুণ্যে আনে সুখ– এ কথা সবসময় নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। তবেই সফলতা সম্ভব। সবসময় কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে নিজের ব্যর্থতাকে তুলে ধরি এটাকে ব্যক্তি জীবন হতে পরিহার করতে হবে। ধরুন আপনি কোন ব্যবসায়িক কাজে বাইরে যাচ্ছেন। কাজটি করতে না পারলে আপনার ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে। এ রকম সময় আপনার বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেহেতু আপনি নির্ধারিত দিনে প্রোগ্রামটি বাতিল করছেন। তাই এটিও একটি অজুহাত। অজুহাতগুলোকে সবসময় পিছনে ফেলে সময়কে কাজে লাগাতে হবে। এই মুহূর্তে যদি আপনার মৃত্যু হয় তাহলে কি পৃথিবী থেমে যাবে? এটা আপনাকে ভাবতে হবে। আমরা শুধু মানসম্মানের কথা ভেবে কাজকে ছোট ভাবি। যারা কাজকে ছোট ভাবে তারা কখনই উন্নতি করতে পারে না। জীবনকে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছাতে হলে সময়ের মূল্য দিতে হবে। ধরুন একজন রিকশা চালক অনেক কষ্ট করে এক কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল। এখন কি আপনি তাকে কোটিপতি বলবেন না? ঐ রিকশা চালক কি তার কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে জীবনকে বদলাতে পারবে না? সুতরাং অর্থবিত্তের মালিক হতে হলে কাজ করতে হবে। কোন কাজেই লজ্জা করা যাবে না। আপনি যদি কোন পরিবারের কর্তা ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে আপনার ওপর নির্ভরশীল প্রত্যেক সদস্যেরই আয়ের পথ সৃষ্টি করে দিতে হবে। আপনার বাসায় একটি টিউবওয়েল আছে, প্রতিদিন টিউবওয়েলের নোংরা পানি কোন গর্ত বা ডোবায় রাখছেন, অথচ আপনি একটু চিন্তা করলেই নোংরা পানিপূর্ণ গর্ত বা ডোবাটি কাজে লাগাতে পারেন। আপনি যদি সামান্য অর্থে কিছু মাছের পোনা সংগ্রহ করে গর্ত বা ডোবায় চাষ শুরু করেন তাহলে সেখান থেকে আয়ের পথ সৃষ্টি হবে। আপনার বাসায় প্রতিদিন না হোক, কোন সময় অতিথি আসবেই। সেক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বাজার থেকে হাঁস-মুরগির ডিম অথবা মাংস ক্রয় করে অতিথিদের আপ্যায়ন করছেন। বাড়িতে প্রতিদিনই কোন না কোনভাবে খাবার উদ্বৃত্ত বা নষ্ট হচ্ছে। আপনি ইচ্ছে করলে উদ্বৃত্ত বা নষ্ট খাবারও কাজে লাগাতে পারেন। যেমন হাঁস-মুরগি, কবুতর পালন করে। সেখান থেকে আপনার আয়ের পথও সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি দেখবেন অতিথি আপ্যায়নে মাংস ও ডিমের চাহিদা পূরণ হচ্ছে এবং দু'-তিন মাস পর পর সেখান থেকে অনেক টাকা উপার্জন করছেন। বাড়িতে প্রায়ই গাছের ডালপালা, লতাপাতা সরিয়ে দিচ্ছেন। বাড়ির পাশে জমিতে অনেক ঘাস, আপনি একটু সময় নিয়ে ছাগল পালনের মাধ্যমে সেখান থেকেও আয়ের পথ সৃষ্টি করতে পারেন। আপনার মা, বোন, স্ত্রী বাড়িতে গল্পগুজব করে সময় কাটাচ্ছে। এতে বাধা দিচ্ছি না। কিন্তু গল্পগুজবের মধ্যেও তারা বাড়তি অর্থ আয় করতে পারেন। আপনি বাজার থেকে কিছু নোংরা কাগজ কিনে নিয়ে ময়দাগুলিয়ে তাদের দিন। তারা গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ঠোংগা তৈরী করে আপনাকে দিবেন এবং আপনি ঠোংগাগুলো বাজারে বিক্রির মাধ্যমে অর্থ আয় করতে পারবেন। সব কিছুই নির্ভর করছে আপনার নিজের সদিচ্ছার ওপর। সময়কে কাজে লাগাতে হবে। এটা আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে। ব্যবসায় সফলতা পাচ্ছেন না। এজন্য সবসময় হতাশায় ডুবে আছেন। যারা হতাশায় ডুবে থাকে তারা কখনও সাফল্যের মুখ দেখে না। যেখানে আপনি পরাজিত হচ্ছেন, সেখান থেকেই অভিজ্ঞতা নিয়ে পুনরায় কাজ শুরু করুন। সাফল্য আপনার অবশ্যই আসবে। বাড়ীতে মহিলাদের সেলাই মেশিন কিনে দিয়ে তাদের আয়ের পথ সৃষ্টিসহ আপনার পরিবারের কিছুটা ব্যয় কমিয়ে আনতে পারেন। কোন না কোন সময় আশপাশের বাড়ীর লোকজনের পোশাক তৈরী করে বাড়তি আয় করতে পারে আপনার পরিবারের সদস্যরা। আপনাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে। যে কৃষক সূর্য উদয়ের পূর্বে মাঠে যায় এবং সূর্যাস্তের পর কাজ শেষ করে বাড়ী ফেরে তার জমিতে অবশ্যই সোনার ফসল ফলে। যারা শ্রম দেয় তারা কখনোই পিছনে থাকে না। কোন ব্যবসা শুরু করছেন। ব্যবসায় সাফল্য আনতে হলে আপনাকে অবশ্যই শ্রম দিতে হবে। পরিশ্রমী কৃষকের মতো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হবে। সঠিক চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করলে কিছুই বিফলে যায় না। পড়াশুনার পাশাপাশি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়ীতে বসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ডাটা এন্ট্রির কাজ করেও প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সম্ভব।

ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে ডাটা এন্ট্রির কাজ নিয়ে দেশের বেকার যুবকদের দ্বারা তা বাস্তবায়ন করছে। কম্পিউটার বিষয়ে আপনার সামান্য দক্ষতা দ্বারা আপনি এই ডাটা এন্ট্রি কাজ করার মাধ্যমে আপনার বেকারত্বের গ্লানি মুছে ফেলতে পারেন। আপনি এই কাজের দ্বারা অর্থ উপার্জনের জন্য খোঁজ নিয়ে দেখতে পারবেন যে, আপনার আশপাশে কতিপয় ব্যক্তি এই ডাটা এন্ট্রি পেশার সঙ্গে জড়িত থেকে হাজার হাজার টাকা আয় করছে। সব কিছুতেই আপনাকেই এগিয়ে আসতে হবে। কাজকে যারা ছোট ভেবে অবহেলা করে তারা

কখনোই সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারে না। ধরুন আপনি বাসে করে কোথাও যাচ্ছেন এরকম মুহূর্তেও অর্থ আয় করতে পারেন। দু-চার প্যাকেট চকলেট বা চুইংগাম ক্রয় করে ঐ বাসেই চলার পথে বিক্রয়ের মাধ্যমেও অর্থ উপার্জন সম্ভব। পৃথিবীতে কেউ অর্থ, বিত্ত, টাকা কড়ি নিয়ে জন্মায় না। সব কিছুকেই অর্জন করতে হয়। আমরা প্রত্যেকেই ভোজন বিলাসী। এককে জনের নেশা এককে রকম। প্রাত্যাহিক জীবনে ব্যয়কে কমিয়ে এনে যারা অর্থ সঞ্চয় করতে পারে তারাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারে। আপনার বাড়ীতে আধা কেজি মাংস দিয়েই একদিনের তরকারীর চাহিদা যেখানে মেটানো সম্ভব, সেখানে ১ কেজি মাংস ক্রয়ের কি প্রয়োজন আছে? চার জোড়া সার্ট, প্যান্ট হলে আপনার বেশ চলে। সেখানে অহেতুক অর্থ খরচ করে ব্যয়বহুল সার্ট, প্যান্ট পরিধানের কারণ কি? অপব্যয়কারীকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখনোই পছন্দ করেন না। অপব্যয়কারীরা সব সময়ই দুর্ভোগে নিমজ্জিত হয়। পৃথিবীতে প্রত্যেক জীবের জন্য স্রষ্টা নিজেই জীবিকা নির্বাহের পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। একটি বড় পাথরের ভেতরে যে কীট-পতঙ্গ বসবাস করে তার জন্যও রাব্বুল আলামিন খাবার যোগাড় করে দেন। তাই বলে আপনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে খাবারের আশায় বসে থাকলে কখনোই খাবার আপনার সামনে আসবে না। আপনাকে খাবারের সন্ধান করতে হবে। তবেই তা আপনার নাগালের মধ্যে চলে আসবে। একদিনেই ১শ' তলা ভবন নির্মাণ হয় না। দীর্ঘসময় নিয়ে অনেক শ্রমিকের কঠোর শ্রমের বিনিময়ে নির্মিত হয় ১শ' তলা ভবন। ঠিক তেমনি কেউ কোটিপতি হতে চাইলে অনেক সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়। আমরা সব সময়ই অল্পসময়েই অনেক কিছু অর্জন করতে চাই। যে গরুটি প্রতিদিন আপনাকে ৫ লিটার দুধ দিচ্ছে আবার বছর শেষে একটি বাছুর দিচ্ছে তার তেমন খোঁজখবর রাখেন না। অথচ ঐ গরুর গোবর থেকে জ্বালানি হচ্ছে। সার হচ্ছে। প্রতিদিনের দুধ বিক্রির টাকায় সংসার চলছে। সেই গরুটিই ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে গোয়ালে ঘুমাচ্ছে। ঠিকমত খাবার পাচ্ছে না। কিন্তু আপনি প্রতিদিনই ভালমন্দ খাচ্ছেন। মশারী খাটিয়ে খাটে ঘুমাচ্ছেন। এটা কি আপনার কাছে আশা করা যায়? সুতরাং যেখান থেকে আপনার আয় হচ্ছে সেই উৎসের প্রতি প্রত্যেকেরই যত্নশীল হওয়া উচিত। আপনি পাকা বিল্ডিং ঘরে ঘুমাচ্ছেন। আপনার ছাদে পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা রয়েছে। খোলা উঠানে জায়গা রয়েছে। এই সব জায়গা কাজে লাগিয়ে অনেকে প্রচুর অর্থ আয় করছে। আপনি ইচ্ছে করলে এই সব জায়গায় ফলের বাগান করতে পারেন। আমরা সবসময় হীন মনমানসিকতায় ভুগি। প্রাচীনতম ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করে আধুনিক জ্ঞানে বিকশিত হতে হবে। এখন আর নারী-পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা দু'জনই নারী। দীর্ঘসময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অর্মত্য সেনসহ আরও অসংখ্য মানুষের জীবনী পর্যালোচনা করে দেখুন তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে কতটুকু অক্লান্ত শ্রম দিতে হয়েছে। এমনিতেই কেউ সাফল্যের মুখ দেখেন না। তা অর্জন করে নিতে হয়েছে। যে ছাত্রটি নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করে না, পড়াশুনায় ফাকি দেয়। ঐ ছাত্রটি কখনোই ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে না। আবার যে ছাত্রটি নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করে, মনোযোগ সহকারে পড়ালেখা করে ঐ ছাত্রটি বছর শেষে ভাল রেজাল্ট অর্জন করে। এ বাস্তবতাকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না। পারবেও না। হতাশাগ্রস্ত মানুষ সব সময় পরাজিত হয়। ধরুন আপনি ছোট একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কোন এনজিও থেকে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেছেন। প্রতি সপ্তাহে আপনাকে কিস্তির মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করতে হয়। বৃষ্টি বাদলের কারণে আপনার ব্যবসায় তেমন অর্থ আয় হয়নি। এরকম অবস্থায় আপনি সাপ্তাহিক কিস্তির টাকা যোগাড় করতে না পেরে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। এ অবস্থায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে টাকার সন্ধান করলে কি হবে? ধরে নিন আপনি এক সপ্তাহের কিস্তির টাকা পরিশোধ করলেন না। কিন্তু অন্য সব সপ্তাহের কিস্তির টাকা তো পরিশোধ করতে পেরেছেন। এটাই আপনার সাফল্য। কিন্তু ব্যবসা বন্ধ করে বসে থাকলে কখনোই টাকা আয় করা সম্ভব না। আপনি কি সত্যিই সাফল্য অর্জন করতে চান? তাহলে আপনাকে সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো কতগুলো বাস্তবমুখী স্বপ্ন দেখতে হবে। আপনার এই স্বপ্নগুলোকে শুধু মনের ভেতর আঁকড়ে ধরে রাখলেই চলবে না। স্বপ্নগুলোর বাস্তবায়ন করার জন্য আপনাকে অবশ্যই প্রথমে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যা হবে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা। পরিকল্পনাগুলোকে সর্বপ্রথম আপনার মানসিকতায় সাজাতে হবে। এর পর এগুলোর তালিকা তৈরী করে পর্যায়ক্রমে সেগুলোর বাস্তব প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন নিজেকে জানা। আগে নিজেকে জানুন। আপনার দ্বারা কি করা সম্ভব। আপনি কোন বিষয়ে দক্ষ। আপনার দক্ষতাকে কাজে লাগান। মানসিকতাকে আপনার স্বপ্ন পূরণের বড় পুঁজি মনে করে স্বপ্নগুলো পূরণের লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। কেননা পৃথিবীতে যারা

সাফল্য অর্জন করেছেন তাদের সাফল্যের মূলেই রয়েছে মানসিকতা। যে ব্যক্তির মানসিকতা যত বড় সে ব্যক্তির সাফল্যও তত বড়। ধরুন, আপনি একজন এসএসসি পরীক্ষার্থী। আপনার সর্বোচ্চ সাফল্য কামনা করেন মা, বাবা ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। আপনিও চান পরীক্ষায় গৌরবময় সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করে মা, বাবা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মুখ উজ্জ্বল করতে। তাই আপনার সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে আপনাকে আগে থেকেই মানসিকতায় স্থাপন করতে হবে পরীক্ষায় আপনি কোন গ্রেড অর্জন করতে চান? আপনি যদি আপনার মানসিকতায় স্থাপন করেন আপনার অর্জন ই+ তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনি পাবেন ই+ গ্রেড। আর যদি আপনি আপনার মানসিকতায় স্থাপন করেন ই গ্রেড তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, আপনি পাবেন ই- গ্রেড। যদি আপনার মানসিকতায় স্থাপন করা থাকে উ গ্রেড তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকেন আপনি পাবেন এ গ্রেড। বলা চলে যে ব্যক্তির মানসিকতায় কোন বড় কিছু অর্জনের স্বপ্ন নেই, সে ব্যক্তি কোন দিনও বড় কিছু অর্জন করতে পারে না। মানুষ ঘুমের মধ্যে যা দেখে তা কখনোই স্বপ্ন নয়। কিন্তু জেগে জেগে যা কল্পনা করে তাই তার স্বপ্ন। সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে আজ অবধি মানুষ যত কিছু আবিষ্কার করেছে, তাদের প্রতিটি আবিষ্কারের পিছনে ছিল কোন না কোনভাবে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি। তাই বলে কি তারা আবিষ্কার থেকে বিরত ছিলেন? না তারা কখনোই আবিষ্কার থেকে বিরত ছিলেন না। কারণ তারা তাদের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকলে কোন দিনই তাদের আবিষ্কারের সাফল্য অর্জন সম্ভব হত না। অনেকে টাকা-পয়সা, অর্থকড়ি অঢেল খরচ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেও সাফল্যের মুখ দেখেন না। প্রত্যেক মানুষের ব্যবহার আচার-আচরণ এবং সৌজন্য বোধ তার আয়ের পথে বিরাট ভূমিকা পালন করে। আর এই সব বিষয়ের ওপর অনেকটা সাফল্য নির্ভর করে। একজন বদরাগী এবং নিরস ব্যবসায়ীর কাছে সহজে গ্রাহক বা খরিদদার আসে না। নিজের মধ্যে যতই দুঃখ-বেদনা থাকুক না কেন তা কখনোই অন্যকে বুঝতে দেওয়া যাবে না। প্রত্যেকেই নিজের প্রশংসা শুনতে ভালবাসে। সবসময় হাসি মুখেই সবকিছু গ্রহণ করার মানসিকতা রাখতে হবে। ধরুন, আপনি ব্যবসায়িক কারণে কোন বন্ধুকে বেশ কিছু টাকার মালামাল বাকিতে দিয়েছেন। এরকম সময় ঐ বন্ধুর কাছ থেকে টাকা উঠানোর চেষ্টা করছেন। সেক্ষেত্রে বন্ধুটিকে রাগান্বিত হয়ে টাকা চাইলে এতে বন্ধুত্ব যেমন নষ্ট হবে তেমনি আপনি ব্যবসায়িক ক্ষতিতে পড়বেন। আপনাকে হাসি মুখেই ঐ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে হবে। তারপর আপনার পাওনা টাকা চাইতে হবে। হয়তো বা একবার, দু'বার, তিনবার আপনাকে বন্ধুটি ঘুরাবে কিন্তু কোন না কোন সময় চক্ষুলজ্জায় সে আপনার টাকাটা অবশ্যই পরিশোধ করবে। আর এভাবেই আপনি সঠিক চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করলে অবশ্যই প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করবেন।

মোঃ রফিকুল ইসলাম

কলেজ রোড, ডাকবাংলা পাড়া, কুড়িগ্রাম।